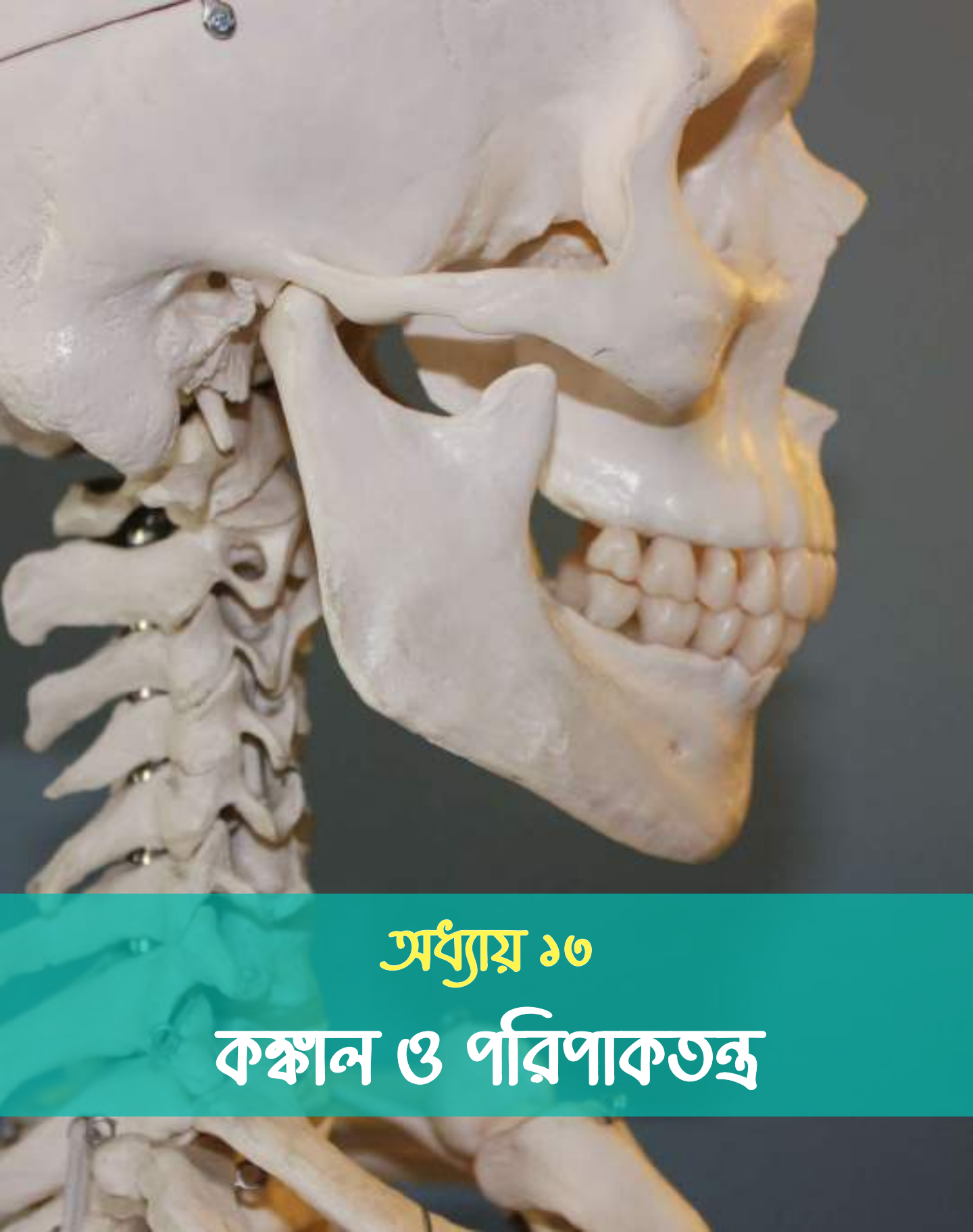

অধ্যায় ১৩

কঙ্কাল ও পরিপাকতন্ত্র

অধ্যায় ১৩ কঙ্কাল ও পরিপাকতন্ত্র

এই অধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শিখতে পারবে—

- ☑ কঙ্কালতন্ত্র
- ☑ অস্থি বা হাড়
- ☑ অস্থিসন্ধি
- ☑ কঙ্কালতন্ত্রের কাজ
- ☑ পরিপাকতন্ত্র
- ☑ পরিপাকগ্রন্থি ও সেগুলোর কাজ
- ☑ খাদ্য পরিপাকসংক্রান্ত কিছু সাধারণ রোগ ও তার প্রতিকার
- ☑ পরিপাকতন্ত্রের যত্ন

আমাদের দেশে যারা তোমাদের মতো স্কুলে লেখাপড়া করে, তাদের একেকজনের স্কুল একেক রকম। কোনোটি ব্যস্ত শহরের মাঝখানে, কোনোটি গ্রামের নিরিবিলি পরিবেশে। কারো স্কুল অনেক বড় দালান, কারো স্কুল ছোট কয়েকটি ঘর। কিন্তু তোমরা কি ভালো করে খেয়াল করেছ, কীভাবে স্কুলের ঘর বা বিল্ডিংটি তৈরি হয়েছে? কারা স্কুলটিকে চালিয়ে রেখেছে?

যেকোনো ভবন তৈরি হয় একটি কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে।

খোঁজ করলে জানতে পারবে, একটি স্কুলঘর তৈরির জন্য সবার আগে দরকার হয় একটি কাঠামোর। পাকা ঘর হলে লোহা বা ইস্পাতের শক্ত রড দিয়ে ওই কাঠামো তৈরি করা হয়। এরপর এই কাঠামোর সঙ্গে ইট, সুরকি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। ধারাবাহিকভাবে এরপর দেয়াল তৈরি হয়, ছাদ, দরজা-জানালা ইত্যাদি তৈরি হয়। কাঁচা বা আধাপাকা ঘর হলে কখনো বাঁশ, কাঠ কিংবা লোহার খুঁটি দিয়ে তৈরি হয় ঘরের কাঠামো। তারপর এই কাঠামোতে টিনের বেড়া দেওয়া হয়, উপরে বসে টিনের চাল। মোটকথা, ব্যবহার করার মতো একটি ঘর তৈরির জন্য একটি কাঠামো লাগবেই। স্কুলঘরটি তৈরি হবার পর এখানে আসেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। তারা প্রত্যেকে তাদের নিজ নিজ কাজ করার মাধ্যমে স্কুলটিকে সচল রাখেন।

এই যে উদাহরণটি দেখলে, এর সঙ্গে ভীষণ মিল পাবে আমাদের শরীরের। উদাহরণের স্কুলঘরের মতো আমাদের শরীরেরও একটি কাঠামো আছে। মানব শরীরের কাঠামোকে বলা হয় কঙ্কাল (Skeleton)। এই কঙ্কালের ওপর আছে শরীরের মাংসপেশি (Muscle), চামড়া (Skin) ইত্যাদি। শরীরের ভেতরে আছে

ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, কলিজা ইত্যাদি অঙ্গ। আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ সেগুলোর কাজ ঠিকঠাক করে চলছে—এক অঙ্গ আরেক অঙ্গের কাজে সহযোগিতা করছে। এভাবে সেগুলো আমাদের শরীরটাকে সচল রাখছে।

ষষ্ঠ শ্রেণিতে একাদশ অধ্যায়ে আমাদের মানব শরীরের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া আছে, তোমার চাইলে চট করে ছোট ভাইবোনদের কাছ থেকে বইটা নিয়ে এই অধ্যায়টা একবার দেখেও নিতে পারো। সেখানে শরীরের কোষ থেকে শুরু করে কীভাবে বিভিন্ন অঙ্গ এবং তন্ত্র গঠিত হয় তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে। অনেকগুলো অঙ্গ মিলে যখন একই কাজে নিযুক্ত হয়, তখন সেগুলোকে তন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

আমাদের শরীর গঠনের কাঠামো হিসেবে কাজ করে আমাদের কঙ্কালতন্ত্র।

তাহলে উপরের আলোচনা থেকে বলা যেতে পারে, আমাদের শরীরের যে কঙ্কাল ও সংশ্লিষ্ট অঙ্গগুলো আছে, সেগুলো মিলে আসলে একটি তন্ত্র তৈরি করে। কারণ, সেগুলো সমবেতভাবে আমাদের মানব শরীরের একটি কাঠামো প্রদান করার মতো কাজটি সম্পন্ন করছে। আমাদের মাংসপেশি সরাসরি কঙ্কালের সঙ্গে যুক্ত থাকে। আমরা যে হাঁটাচলা করি, খাই, বই পড়ি এসব কাজেই কঙ্কালের সঙ্গে মাংসপেশিগুলোও যোগ দেয়। এ কারণে কঙ্কাল ও মাংসপেশিকে একসঙ্গে মিলিয়ে পেশি-কঙ্কালতন্ত্র হিসেবে আলোচনা করা যায়।

শুধু শরীরের তো কাঠামো থাকলেই হবে না। এর বৃদ্ধির দরকার হবে, একে বাঁচিয়েও রাখতে হবে। আমরা বেঁচে থাকার জন্য যত রকম কাজ করি, সব কিছুর জন্য শক্তির দরকার হয়। এই শক্তি আসে আমাদের খাবার থেকে। আমরা যেসব খাবার খাই, সেগুলোকে ভেঙে পুষ্টি উপাদান বের করে আমাদের কোষের ভেতরে পৌঁছানোর উপযোগী করে আমাদের শরীরের আরেকটি তন্ত্র। একে বলা হয় পৌস্টিকতন্ত্র বা পরিপাকতন্ত্র।

এই অধ্যায়ে আমরা কঙ্কালতন্ত্র এবং পৌস্টিকতন্ত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত জানব। কিছু নতুন নাম, শব্দ হয়তো আলোচনায় আসবে। কিন্তু সবার আগে খেয়াল করবে সেগুলো কী কাজ করছে, কীভাবে কাজ করছে। তাহলে নতুন নাম বা শব্দগুলোর সঙ্গে পরিচিত হতে কোনো সমস্যা হবে না।

কঙ্কালতন্ত্র

আমাদের শরীরকে একটি কাঠামো প্রদান করে শরীরের শক্ত ও কোমল হাড়গুলো। তোমরা অনেকেই হয়তো জানবে 'হাড়' শব্দটির আরেকটি প্রতিশব্দ হচ্ছে 'অস্থি'। কঙ্কালতন্ত্রের আলোচনায় আমরা অস্থি শব্দটিই ব্যবহার করব।

অস্থি (হাড়) ও তরুণস্থি (কোমল হাড়) দ্বারা গঠিত যে তন্ত্র দেহের মূল কাঠামো গঠন করে এবং অভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ ও কোমল অঙ্গসমূহকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে তাকে কঙ্কালতন্ত্র বলে। মানবদেহের কঙ্কালতন্ত্র বহিঃকঙ্কাল ও অন্তঃকঙ্কাল নিয়ে গঠিত। নাম শুনেই বুঝতে পারছ, অন্তঃকঙ্কাল আমাদের

শরীরের ভেতরে থাকে। তাই একে বাইরে থেকে দেখা যায় না। অপরদিকে, বহিঃকঙ্কাল বলতে শরীরের দৃশ্যমান শক্ত অঙ্গগুলো যেমন নখ, দাঁত, লোম, চুল প্রভৃতিকে বুঝায়।

অস্থি বা হাড়

তুমি তোমার নিজের হাত-পায়ে একটু জোরে চাপ দিলেই চামড়ার নিচে শক্ত অস্থি বা হাড়ের উপস্থিতি টের পাবে। অস্থিকে সাধারণভাবে শরীরের কঠিন ও প্রাণহীন অংশ মনে হতে পারে। আসলে তা নয়, অস্থি হলো এক ধরনের জীবন্ত টিস্যু। এ টিস্যু শক্ত ও স্পঞ্জ-জাতীয় উভয় পদার্থে গঠিত। অস্থির বাইরের অংশটি শক্ত, কিন্তু ভিতরের অংশে স্পঞ্জ-জাতীয় পদার্থ থাকে, যাকে অস্থিমজ্জা বলা হয়। অস্থিমজ্জার শতকরা ৪০ ভাগ জৈব পদার্থ ও বাকি ৬০ ভাগ অজৈব পদার্থ। অজৈব অংশ ক্যালসিয়াম ফসফেট ও ক্যালসিয়াম কার্বনেট দ্বারা গঠিত। স্বাভাবিক অবস্থায় অস্থিতে শতকরা ৪০-৫০ ভাগ পানি থাকে। অন্যান্য অঙ্গের মতো প্রতিটি অস্থিতে রক্ত ও স্নায়ুর সরবরাহ থাকে। খেয়াল করো যে স্নায়ুর মাধ্যমে আমরা এবং সকল প্রাণী যেকোনো উদ্দীপনা বা উত্তেজনা গ্রহণ করা এবং তাতে সাড়া দিয়ে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো এবং শরীরের অন্য অঙ্গের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারি।

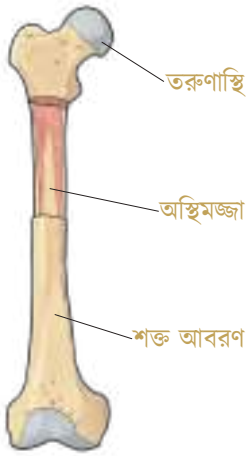

অস্থির বিভিন্ন অংশসমূহ

তরুণাস্থি: অস্থির তুলনায় তুলনামূলকভাবে নমনীয় এবং সজীব হচ্ছে তরুণাস্থি। সাধারণত অস্থির প্রান্তভাগে নীলাভ আবরণের মতো তরুণাস্থি অবস্থান করে। তরুণাস্থি অস্থি নড়াচড়াকে সহজ করে এবং দুই বা ততোধিক অস্থির সংযোগস্থলে থাকে, যাকে অস্থিসন্ধি বলা হয়। তরুণাস্থির উপরিভাগ সাধারণত মসৃণ থাকে। তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ যে, নতুন যে শিশু জন্ম নেয়, তার শরীর অনেক নমনীয় থাকে। এর কারণ তার শরীর মূলত তরুণাস্থি দিয়ে গঠিত। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এসব তরুণাস্থি ধীরে ধীরে শক্ত অস্থিতে পরিণত হয়।

দুটো হাড়ের সংযোগস্থলে নমনীয় তরুণাস্থি।

অস্থি আবরণী: অস্থির বাইরে যে মজবুত ও পাতলা আবরণ শক্তভাবে আটকে থাকে, তাকে বহিরাবরণ (Periosteum) বলে। বহিরাবরণের ভিতর দিয়ে রক্তনালি ও স্নায়ু যাতায়াত করতে পারে। তাছাড়া অস্থির নড়াচড়া বা সঞ্চালনের জন্য প্রয়োজনীয় মাংসপেশি ও পেশিবন্ধনী এর উপর এসে আটকায়। এখানে তোমাদের সংক্ষেপে জানিয়ে রাখি যে, দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালন ঘটানোর জন্য শরীরের মাংসপেশি কাজ করে। আর পেশিবন্ধনী বা টেন্ডন (Tendon) হলো একটি সংযোগকারী টিস্যু যা হাড়ের সঙ্গে পেশিকে সংযুক্ত করে। এসব বিষয়ে উপরের শ্রেণিতে আরো জানতে পারবে।

অস্থিসন্ধি

মানবদেহের অস্থিগুলো বিভিন্নভাবে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে অন্তঃকঙ্কাল তৈরি করেছে। দুই বা ততোধিক অস্থির সংযোগস্থলকে অস্থিসন্ধি বলে। প্রতিটি সন্ধির অস্থিপ্রান্তগুলো এক রকম নমনীয় রজ্জুর মতো বন্ধনী দিয়ে শক্তভাবে আটকানো থাকে, ফলে অস্থিগুলো সহজে সন্ধিস্থল থেকে সরে যেতে পারে না।

কোনো কোনো অস্থিসন্ধি একেবারে অনড়, যেমন মাথার খুলির অস্থিসন্ধি ও কোমরের দিকের শ্রেণিচক্রের সন্ধি। কিছু অস্থিসন্ধি আবার সামান্য নড়াচড়া করতে পারে, ফলে আমরা দেহকে সামনে, পিছনে ও পাশে বাঁকাতে পারি, যেমন- মেরুদণ্ডের অস্থিসন্ধি। এগুলো ছাড়া দেহে প্রায় ৭০টিরও বেশি সহজে নড়াচড়া করা যায় এ রকম অস্থিসন্ধি রয়েছে। এদেরকে সাইনোভিয়াল সন্ধি বলে। সাইনোভিয়াল সন্ধিস্থলে একটি অস্থির একদিকের বলের মতো গোল অংশটি অন্য অস্থির কোটরে এমনভাবে স্থাপিত হয় যে, অস্থির সকল দিকে চলাচল সম্ভব হয়। এ ধরনের সন্ধিতে সাইনোভিয়াল (Synovial) রস নামক এক প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ থাকায় অস্থি দুটি সহজে নড়াচড়া করতে পারে। হাতের কনুই, হাঁটু ও কাঁধের সন্ধি সাইনোভিয়াল সন্ধির অন্তর্ভুক্ত।

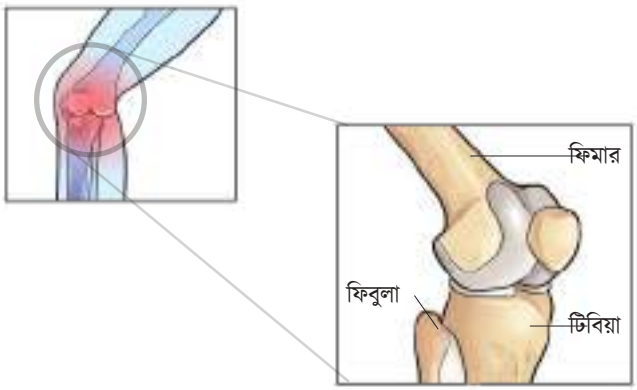

আমাদের হাঁটুর সন্ধি সাইনোভিয়াল সন্ধির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কঙ্কালতন্ত্রের কাজ

- কঙ্কাল দেহকে নির্দিষ্ট আকৃতি প্রদানে সহায়তা করে এবং দেহের মজবুত কাঠামো গঠন করে।
- অস্থিসন্ধি গঠনের মাধ্যমে এটি চলাচলে সাহায্য করে।
- কঙ্কাল দেহকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সহায়তা করে।
- ভ্রূণ অবস্থা থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত কঙ্কালের মজ্জা বিভিন্ন প্রকার রক্তকণিকা তৈরি করে। এ কারণে অস্থিসমূহকে রক্ত উৎপাদনের কারখানা বলা হয়।
- দেহের অভ্যন্তরীণ সকল চাপ নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
- আমাদের দেহের অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং নরম অঙ্গসমূহ যেমন মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পাকস্থলী ইত্যাদিকে বাইরের যেকোনো রকম ক্ষয়ক্ষতি থেকে প্রাথমিক সুরক্ষা দেয় আমাদের কঙ্কালতন্ত্রের সংশ্লিষ্ট অংশ।

পরিপাকতন্ত্র

প্রতিদিন আমরা জীবনের যতগুলো কাজ করি, তার মধ্যে একটি খুবই সাধারণ কাজ হচ্ছে খাদ্য গ্রহণ। কখনো কি ভেবে দেখেছ আমরা যে বিচিত্র রকম খাবার খাই সেগুলো কীভাবে আমাদের শরীর ব্যবহার করে? আমাদের শরীরের সকল কাজ হয় যে কোষগুলোর মাধ্যমে সেগুলো কোনোটিই কিন্তু আমাদের গ্রহণ করা খাবারগুলো সরাসরি কাজে লাগাতে পারে না। বরং সকল খাবারকেই সেটি ভেঙে এমন কিছু উপাদান বের করে নেয়, যা শরীরের শক্তি ও পুষ্টি উপাদান প্রদান করে। এর মাধ্যমেই শরীরের টিকে থাকা এবং ক্ষয় পূরণের কাজ সম্পন্ন হয়। এই প্রক্রিয়ায় শরীরের যা প্রয়োজন তা-ই শরীর গ্রহণ করে বাকিটা বর্জ্য বা অপ্রয়োজনীয় বস্তু হিসেবে শরীর থেকে বের হয়ে যায়। এ কাজ করার জন্য যে তন্ত্র কাজ করে সেটির নাম পরিপাকতন্ত্র। সব জীবের বেঁচে থাকার জন্য শক্তি প্রয়োজন, খাদ্য পরিপাক করার মাধ্যমেই এই শক্তি আসে।

আমরা মুখ দিয়ে খাবার খাই। খাদ্য গিলে ফেলার পর আমরা খাদ্যকে আর দেখতে পাই না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই খাদ্য পরিপাক হয়ে সরল উপাদানে পরিণত হয়, যা দেহ শোষণ করে নেয়। হজম না হওয়া অপ্রয়োজনীয় বস্তুগুলো দেহ মল বা বর্জ্য রূপে বের করে দেয়। খাদ্য গ্রহণ এবং মল নিষ্কাশণ—এই দুটি ঘটনার মাঝখানে দেহের ভিতর খাদ্যের যে পরিবর্তন ঘটছে, তার উপর আমাদের সরাসরি কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। আমরা শরীরের ভেতরের এই কাজগুলো বাইরে থেকে দেখতেও পাই না। সুস্থ দেহে এ কাজটি আপনা-আপনি ঘটে।

পরিপাকতন্ত্র আমাদের শরীরের মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত একটি তন্ত্র। এই তন্ত্র শুরু হয় আমাদের মুখগহ্বর থেকে। এই মুখগহ্বরের শেষ প্রান্ত থেকে ফাঁপা নলের মতো অংশটিকে খাদ্যনালি (বা অন্ননালি) বলে। এই নলটি আমাদের পেটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শেষ হয় পায়ুপথে (anus), যার মধ্য দিয়ে বর্জ্য হিসেবে শরীর থেকে মল বের হয়ে যায়। মুখ থেকে শুরু করে খাদ্যনালির এই শেষ অংশের মধ্যে অবস্থিত নলের বিভিন্ন অংশকে নানান নামে ভাগ করা হয়। এ ছাড়া এই খাদ্যনালির সঙ্গে আরো কিছু অঙ্গ জড়িত যেগুলো খাদ্য পরিপাকে সহযোগিতা করে। পরিপাকতন্ত্র বলতে খাদ্যনালি এবং এর সঙ্গে যুক্ত এসব অঙ্গকে বুঝানো হয়।

আমরা এবার পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ ও অঙ্গসমূহের নাম এবং কাজ সম্বন্ধে জানব।

১. মুখছিদ্র: আমাদের উপরের ঠোঁট এবং নিচের ঠোঁটের মাঝখানের ফাঁকা অংশটুকুই মুখছিদ্র। প্রচলিত অর্থে আমরা একে কেবল 'মুখ' হিসেবেই আখ্যায়িত করি। আমাদের ঠোঁটদুটো খুলে আমরা খাদ্য গ্রহণ করি। মুখছিদ্র পথেই আমাদের গ্রহণ করা খাবার খাদ্যনালিতে প্রবেশ করে।

২. মুখগহ্বর: মুখছিদ্রের পরেই মুখগহ্বরের অবস্থান। সামনে দাঁতসহ দুটি চোয়াল দ্বারা মুখগহ্বর বেষ্টিত। পূর্ণবয়স্ক মানুষের স্থায়ী দাঁতের সংখ্যা ৩২টি। নিচের চোয়ালে ১৬টি আর উপরের চোয়ালে ১৬টি থাকে।

মুখগহ্বরের উপরে রয়েছে তালু এবং নিচের দিকে রয়েছে মাংসল জিহ্বা। চোয়ালের ভেতরের রয়েছে তিনটি গ্রন্থি,

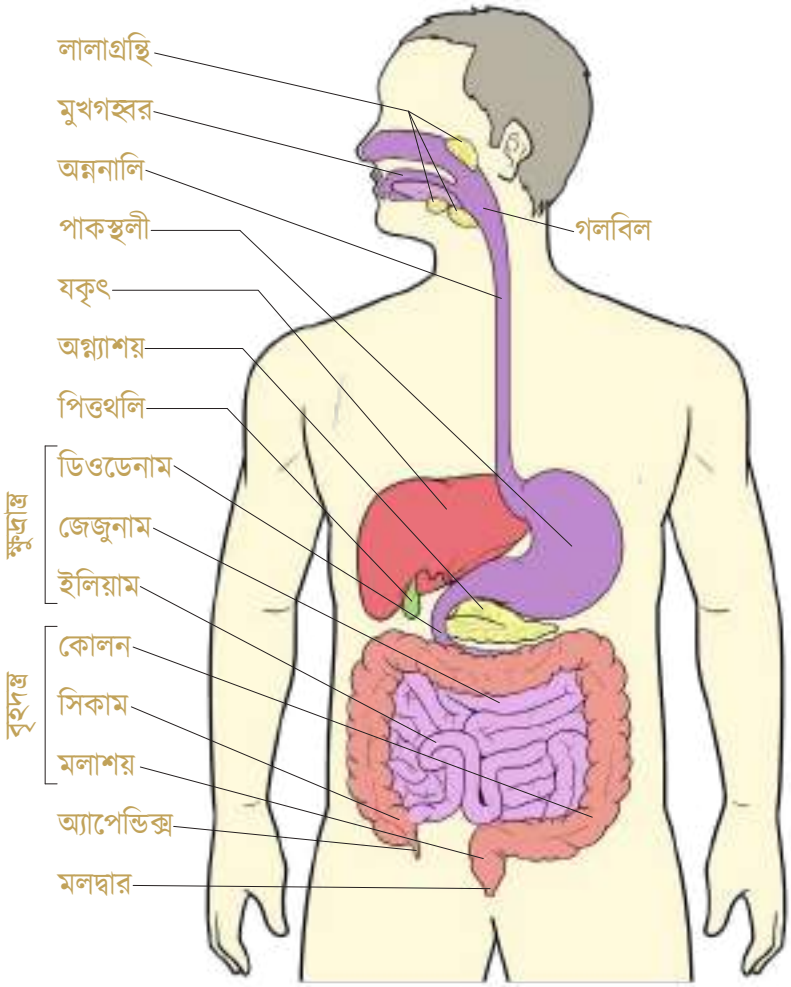

পরিপাকতন্ত্রের অংশসমূহ

যেগুলোকে লালাগ্রন্থি বলে আমরা চিনি, সেখান থেকে নিঃসৃত রস খাদ্য গ্রহণ, গলাধঃকরণ ও পরিপাকে সাহায্য করে। দাঁত আমাদের বড় বড় খাদ্যবস্তুকে কেটে ছোট ছোট করে ফেলে এবং পিষে নরম করতে সাহায্য করে। এসময় জিহ্বা খাদ্যবস্তুর স্বাদ গ্রহণ করে এবং খাদ্যবস্তুকে বার বার দাঁতের নিচে পাঠিয়ে চিবাতে সাহায্য করে। লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালা খাদ্যকে পিচ্ছিল করে এবং খাদ্যবস্তুকে গিলতে সাহায্য করে। লালা রসে এক ধরনের এমাইলেজ নামক উৎসেচক বা এনজাইম রয়েছে, যা শর্করাজাতীয় খাবারকে আংশিক ভেঙে ফেলে। পরবর্তী সময়ে পরিপাকতন্ত্রের অঙ্গগুলো আংশিক ভাঙা শর্করাকে সম্পূর্ণ ভেঙে শক্তি উৎপন্ন করে।

৩. গলবিল: মুখগহ্বরের পরেই এর অবস্থান। এর মাধ্যমেই খাদ্যবস্তু মুখগহ্বর থেকে অন্ননালি বা গ্রাসনালিতে যায়। গলবিলে কোনো এনজাইম নিঃসৃত হয় না। তাই এখানে কোনো খাদ্যবস্তু পরিপাক হয় না।

৪. অন্ননালি: গলবিল ও পাকস্থলীর মাঝামাঝি জায়গায় এর অবস্থান। খাদ্যবস্তু এর ভিতর দিয়ে গলবিল থেকে পাকস্থলীতে যায়।

৫. পাকস্থলী: অন্ননালি ও ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যবর্তী স্থানে এর অবস্থান। গলবিল ও অন্ননালির ক্রমাগত সংকোচনের ফলে পিচ্ছিল খাদ্যবস্তু এখানে এসে জমা হয়। পাকস্থলীর আকৃতি থলির মতো। এর প্রাচীর বেশ পুরু ও পেশিবহুল। পাকস্থলীর প্রাচীরে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি (Gastric glands) নামে প্রচুর গ্রন্থি থাকে। এখানে খাদ্য সাময়িক জমা থাকে। গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয় এক ধরনের রস যাতে নানান রকম উৎসেচক থাকে। পাচক রস নামে পরিচিত এই রস শর্করা, আমিষ এবং চর্বিজাতীয় খাবার পরিপাক করতে সাহায্য করে।

৬. ক্ষুদ্রান্ত্র (Small intestine): ক্ষুদ্রান্ত্র হলো পাকস্থলীর পরবর্তী অংশ। এটা পরিপাকনালির সবচেয়ে দীর্ঘ অংশও বটে। ক্ষুদ্রান্ত্র তিনটি ভাগে বিভক্ত, যথা: (ক) ডিওডেনাম, (খ) জেজুনাম ও (গ) ইলিয়াম।

(ক) ডিওডেনাম: এটা ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশ। পাকস্থলীর পরেই এর অবস্থান এবং দেখতে 'ট' আকৃতির। পিত্তথলি থেকে পিত্তরস এবং অগ্ন্যাশয় থেকে অগ্নাশয় রস নালির মাধ্যমে এখানে এসে খাদ্যের সঙ্গে মিশে। এ রসগুলোও পরিপাকে অংশ নেয়। এখানে আমিষ, শর্করা ও চর্বিজাতীয় খাদ্য উপাদানের পরিপাক ঘটে।

(খ) জেজুনাম: এটা ডিওডেনাম এবং ইলিয়ামের মধ্যের অংশ। এটি ক্ষুদ্রান্তের সবচেয়ে বিস্তৃত অংশ যেখানে খাবারের পরিপাক প্রক্রিয়া অব্যহত থাক।

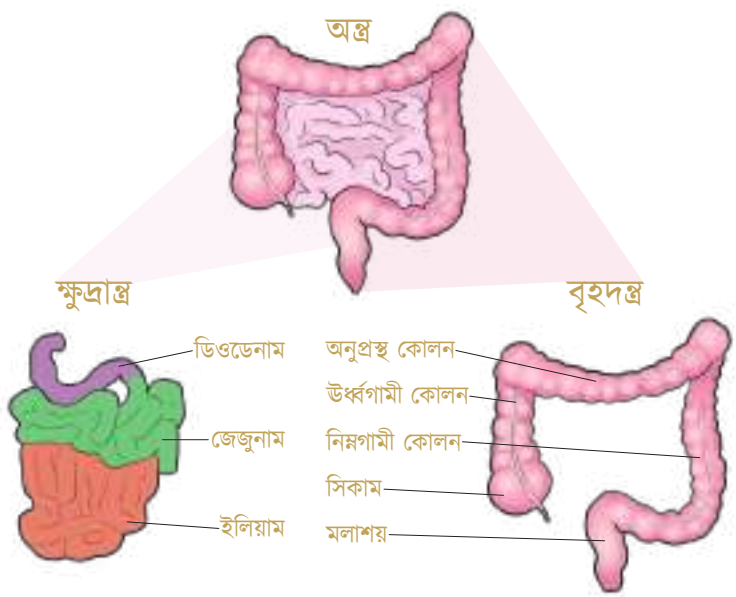

অন্ত্রের বিভিন্ন অংশসমূহ

(গ) ইলিয়াম: এটা ক্ষুদ্রান্ত্রের শেষ অংশ। ইলিয়ামের ভিতরের প্রাচীরে শোষণ যন্ত্র থাকে। ব্যাপন পদ্ধতিতে প্রাচীরের গায়ে আঙ্গুলের মতো প্রক্ষেপিত অংশ (যা শোষণের ব্যাপ্তি বাড়াতে সাহায্য করে) থাকে। এদের একত্রে ভিলাই (Villi) বলে। হজমের পর খাদ্যের সারাংশ ভিলাই দ্বারা শোষিত হয়।

৭. বৃহদন্ত্র (Large intestine): ক্ষুদ্রান্ত্রের পরেই বৃহদন্ত্রের শুরু। এটা ইলিয়ামের পর থেকে পায়ুপথ পর্যন্ত বিস্তৃত। নামে বৃহদন্ত্র হলেও লম্বায় এটা ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে ছোট। কিন্তু ভিতরের ব্যাস ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতরের ব্যাস থেকে বড় থাকে। বৃহদন্ত্র তিনটি অংশে বিভক্ত। যেগুলো হচ্ছে, (ক) সিকাম (খ) কোলন এবং (গ) মলাশয়। মলাশয় হচ্ছে বৃহদন্ত্রের শেষ প্রান্ত। দেখতে একটুখানি থলির মতো। খাদ্যের অপাচ্য বা অহজমকৃত অংশ এখানে মলরূপে জমা হয়।

বৃহদন্ত্রে খাদ্য হজম হয় না। এখানে কোনো পাচক রস বা এনজাইম তৈরি হয় না। বৃহদন্ত্র মূলত খাদ্যের জলীয় অংশ থেকে পানি শোষণ করে। এ কাজটি অত্যন্ত দরকারি। এর ফলে শরীর থেকে পানি বেশি পরিমাণে বের হওয়া রোধ হয়।

৮. মলদ্বার বা পায়ু: এটি পরিপাকনালির শেষ প্রান্ত। এই প্রান্ত পথেই পরিপাক নালি দেহের বাইরে উন্মুক্ত হয়। বৃহদন্ত্রের সর্বশেষ অংশ অর্থাৎ মলাশয়ে খাদ্যের যে অপাচ্য অংশ মল হিসেবে সঞ্চিত হয়, তা প্রয়োজন মতো এই পায়ু দিয়ে শরীরের বাইরে বর্জিত হয়।

পরিপাকগ্রন্থি ও সেগুলোর কাজ

পরিপাকনালির সঙ্গে যুক্ত যেসব গ্রন্থির নিঃসৃত রস খাদ্য পরিপাকে অংশগ্রহণ করে, সেগুলোকে পরিপাকগ্রন্থি বলে। লালাগ্রন্থি, যকৃৎ এবং অগ্ন্যাশয় পরিপাকগ্রন্থির অন্তর্ভুক্ত।

লালাগ্রন্থি: এ গ্রন্থি থেকে লালা ক্ষরণ হয়। লালায় এনজাইম ও পানি থাকে। পানি খাদ্যকে নরম করে। লালার এনজাইম হলো অ্যামাইলেজ।

যকৃৎ: দেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি হলো যকৃৎ। যকৃৎ থেকে পিত্তরস তৈরি হয়। পিত্তরস পিত্তথলিতে জমা থাকে। হজমের সময় পিত্তনালি দিয়ে পিত্তরস ডিওডেনামে এসে খাদ্যের সঙ্গে মেশে। পিত্তরস চর্বিজাতীয় খাদ্য হজমে সাহায্য করে।

অগ্ন্যাশয়: প্রধানত তিন রকমের এনজাইম অগ্ন্যাশয়ে তৈরি হয়—অ্যামাইলেজ, প্রোটিয়েজ এবং লাইপেজ। এগুলো ডিওডেনামে এসে খাদ্যের সঙ্গে মেশে। ট্রিপসিন ও কাইমোট্রিপসিন নামক দুটি প্রোটিয়েজ এনজাইম আমিষ জাতীয় খাদ্য, লাইপেজ চর্বিজাতীয় খাদ্য এবং অ্যামাইলেজ শর্করাজাতীয় খাদ্য হজমে সাহায্য করে।

গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি: গ্যাস্ট্রিকগ্রন্থি পাকস্থলীর ভিতরের প্রাচীরে থাকে। এই গ্রন্থি নিঃসৃত রসের নাম গ্যাস্ট্রিক রস বা পাচক রস।

আন্ত্রিক গ্রন্থি: ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীরের ভিলাসে প্রচুর আন্ত্রিক গ্রন্থি থাকে। এই গ্রন্থি নিঃসৃত রসের নাম আন্ত্রিক রস (Intestinal juice)।

খাদ্য পরিপাকসংক্রান্ত কিছু সাধারণ রোগ ও তার প্রতিকার

আমাদের পুরো শরীরের সুস্থতার একটি বিরাট নির্ভরতা আছে আমাদের পরিপাকতন্ত্রের সুস্থতার ওপর। সঠিক স্বাস্থ্যবিধি না মানলে, জীবন-যাপন সঠিকভাবে না করলে আমাদের পরিপাকতন্ত্রে বেশ কিছু সাধারণ অসুস্থতা দেখা দিতে পারে। নিচে এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো।

১. গ্যাস্ট্রাইটিস: সাধারণত বেশি মসলা ও তেলযুক্ত খাবার খেলে, খাওয়ায় অনিয়ম করলে বুক জ্বালা করে এবং অম্ল রোগ হয়। এতে পেটে বাড়তি অম্ল বা অ্যাসিড তৈরি হয় আর তা থেকে পেট বা বুকের মাঝখানে একটা অস্বস্তি বা জ্বালার ভাব হয়। ফলস্বরূপ গলা ও পেট জ্বালা করে এবং পেটে ব্যথাসহ বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেয়। সময়মতো এ রোগের চিকিৎসা করা না হলে পাকস্থলী ও অন্ত্রে ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে। তখন একে গ্যাস্ট্রিক আলসার বলে।

নিয়মিতভাবে কম মসলা ও কম তেলযুক্ত খাবার খাওয়া এবং সময়মতো খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস করলে এ রোগ প্রতিরারোধ করা যায়।

২. আমাশয় : আমাশয় আমাদের দেশে একটি অতি পরিচিত রোগ। মূলত জীবাণুর সংক্রমণে আমাশয় হয়। দুই ধরনের আমাশয় দেখা যায়। যথা: (ক) অ্যামিবিক আমাশয় এবং ব্যাসিলারি আমাশয়।

(ক) অ্যামিবিক আমাশয়: প্রধানত এন্টামিবা (Entamoeba) নামের এক প্রকার এক কোষী প্রাণী মানুষের অন্ত্রে প্রবেশ করলে এ ধরনের রোগ দেখা দেয়। এ রোগের উপসর্গগুলো হলো, তলপেটে ব্যথা, মলের সঙ্গে রক্ত বা শ্লেষ্মা বের হওয়া।

নলকূপের পানি বা ফুটানো পানি পান; পানি ও শাকসবজি যাতে দূষিত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা; মাছি, তেলাপোকা বা আরশোলা থেকে খাদ্যবস্তুকে রক্ষার মাধ্যমে এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। তবে এ রোগে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসকের পরামর্শে ওষুধ সেবন করা প্রয়োজন।

(খ) ব্যাসিলারি আমাশয়: শিগেলা (Shigella) নামের এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া আমাদের অন্ত্রকে আক্রমণ করলে এ ধরনের আমাশয় হয়। এই জীবাণু বৃহদন্ত্রের ঝিল্লিকে আক্রমণ করে। ফলে বারবার পায়খানা হয় এবং পায়খানার সঙ্গে পিচ্ছিল শ্লেষা বের হয়। অনেক সময় পায়খানার সঙ্গে রক্ত যায়। এ জন্য এ রোগকে রক্ত আমাশয় বলে। এ রোগকে অবহেলা করা ঠিক নয়। ডাক্তারের পরামর্শে চিকিৎসা করা প্রয়োজন। সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

৩. কোষ্ঠকাঠিন্য (Constipation): এটি একটি অস্বাভাবিক শারীরিক অবস্থা যখন একজন ব্যক্তি সহজে মলত্যাগ করতে সক্ষম হন না। কোষ্ঠকাঠিন্য হলে সাধারণত এক-দুই দিন পরপর মলত্যাগের বেগ হওয়া এবং শুষ্ক ও কঠিন মল নিষ্কাশিত হয়। কোষ্ঠকাঠিন্য প্রকৃতপক্ষে কোনো রোগ নয়। তবে কখনো কখনো তা অন্য রোগের লক্ষণ হতে পারে। বিভিন্ন কারণে কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে। যেমন- পৌষ্টিকনালির মধ্য দিয়ে খাদ্যবস্তুর চলন ধীর হওয়া, কাঁচা ফলমূল ও শাকসবজি না খাওয়া, মলত্যাগের বেগ পেলে সঙ্গে সঙ্গে মলত্যাগ না করা ইত্যাদি। দীর্ঘদিন কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে পায়ুপথ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, যা প্রচণ্ড ব্যথার উদ্রেক করতে পারে। বেশির ভাগ মানুষই তাদের জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে এই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে পারে।

নিয়মিত কিছু ব্যায়াম করলে, নিয়মিত মল ত্যাগের অভ্যাস করলে, নিয়মিত শাকসবজি, ফলমূল ও আঁশযুক্ত খাবার খেলে এ অসুবিধা অনেকাংশে দূর করা যায়। বেশি দিন ধরে এই সমস্যা থাকলে ডাক্তারের শরনাপন্ন হয়ে চিকিৎসা নিতে হবে।

পরিপাকতন্ত্রের যত্ন

আমাদের জীবন বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সব শক্তি আমরা পাই খাদ্য পরিপাক করার মাধ্যমে। এ কারণে আমাদের সুস্থ পরিপাকতন্ত্র আমাদের সুস্থ জীবনের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কিছু সাধারণ নিয়ম-কানুন মেনে আমরা আমাদের পরিপাকতন্ত্রকে ভালো রাখতে পারি।

পরিপাকতন্ত্রের যত্ন শুরু হয় আমাদের মুখ থেকে। প্রতিবার খাওয়ার পর দাঁত ব্রাশ করা ও পরিষ্কার করা উচিত। দাঁতের ফাঁকে খাবারের কণা আটকে থাকলে তা পচে মুখে দুর্গন্ধ হয়। দাঁতের ক্ষয় হয়। খুব বেশি মিষ্টিজাতীয় খাবার খাওয়া উচিত নয়। মিষ্টি দাঁতের ক্ষয়ের জন্য দায়ী।

আমরা যেসব খাবার খাব তা পরিষ্কার ও সুসিদ্ধ হওয়া উচিত। বাসি বা পচা খাবার খাওয়া উচিত নয়। আঙুলের নখ ছোট রাখা এবং খাওয়ার আগে থালাবাটি ও হাত অবশ্যই পরিষ্কার করে নিতে হবে। খাবার নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়া উচিত। একসঙ্গে বেশি খাবার খাওয়া যাবে না। সব সময় সুষম খাবার খাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। খাওয়ার কিছুক্ষণ পর পর্যাপ্ত পানি খেতে হবে। সব সময় পানি ফুটিয়ে খেতে হবে কিংবা নিরাপদ ফিল্টার ব্যবহার করতে হবে। খাবার ধীরে ধীরে ভালো করে চিবিয়ে খেতে হবে। অধিক মসলা ও তেলযুক্ত খাবার পরিহার করতে হবে। ফাস্টফুড-জাতীয় খাবার আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর। এ ধরনের খাবারের প্রতি কোনোভাবেই আসক্ত হওয়া যাবে না।

অনুশীলনী ?

১। তোমাদের বইয়ে উল্লেখ করা খাদ্য পরিপাক সংক্রান্ত অসুখগুলো ছাড়া তোমার জানা আরও কয়েকটি অসুখের নাম উল্লেখ করতে পারবে?

২। আমাদের কোন কোন অস্থি-সন্ধি সকল দিকে নাড়াচাড়া করতে পারে?